মহৎসঙ্গ

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

নারদমুনি তাঁর ভক্তিশাস্ত্রে বলেছেন, ''মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব, ভগবৎ কৃপালেশাৎ বা'' (নারদীয়ভক্তিসূত্র, ৩৮)—ভক্তিলাভ করতে মহতের কৃপা যা প্রকারান্তরে ভগবানেরই কৃপা, তার দরকার হয়। তবে এরপরই বলেছেন, ''মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ'' (তদেব, ৩৯)। মহতের সঙ্গ দুর্লভ, কারণ তিনি আমাদের সাধারণ বোধবুদ্ধির বাইরে অবস্থান করেন, তাই তিনি অগম্য অর্থাৎ তাঁকে চেনা মুশকিল। কিন্তু কোনওভাবে যদি তাঁর সঙ্গলাভ করা যায় তাহলে তার ফল অমোঘ। এই অমোঘত্বটুকুই আমাদের পাথেয়। 'সঙ্গ করেছি' বললে কেবল অহংকার করা হবে, কারণ যথার্থ সঙ্গ হলে জীবন সেই ছাঁচে গড়ে ওঠে। তা যখন হয়ে ওঠেনি, তখন স্মৃতিতে তাঁদের খুঁটিনাটি আচার-আচরণ ও সময়োচিত উপদেশের আলোয় এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁদের মহত্ত্বের একটা ধারণা করার প্রচেষ্টা মাত্র হতে পারে। তবে সে-ধারণা একান্তই নিজস্ব বোধবুদ্ধিপ্রসূত। কারও সঙ্গে তা মিললে, তার হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে আনন্দ দিলে তবেই এ-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সার্থকতা।

জীবনে প্রথম সাধু, যাঁর নিজগুণে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম, তাঁর নাম স্বামী বিশ্ববেদানন্দ ওরফে বিমল মহারাজ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, আর-এক বিমল মহারাজ এঁর বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপা যে, প্রথম যাঁকে পেয়েছিলাম তিনি আশ্চর্য প্রেমিক সাধু, যে-গুণটি না থাকলে হয়তো এই রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য অধরাই থেকে যেত। হৃদয় বড় স্পর্শকাতর জায়গা। শুধু তাই নয়, প্রেমের স্পর্শটি নিখাদ অথবা খানিক স্বার্থের কারণে ভানের মিশ্রণ আছে, তা সে ঠিক বুঝে নেয়। তবে অহেতুক প্রেমের প্রকাশ প্রায়শই সূক্ষ্ম, যদিও এক্ষেত্রে তার বাহ্যপ্রকাশের অভাব ছিল না। নাহলে সে-বয়সে অত বিচারবোধ নিয়ে তাঁকে আপনার ভাবা সম্ভব ছিল না। তাঁর সঙ্গে আলাপ যখন, তখন নতুন সংসারে প্রবেশ করেছি, কিন্তু সংসারের সমস্ত আকর্ষণ পেরিয়ে তাঁর প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। সেই আকর্ষণেই ছুটে ছুটে যেতাম বাঁকুড়া মঠে তাঁর কাছে। এর আগে এই পত্রিকায় 'এক অনন্য ত্যাগব্রতী' নামে এক প্রবন্ধে তাঁকে নিয়ে বিস্তারিত লিখেছি তাই পুনরাবৃত্তি করব না, শুধু বলি যে তিনি কখনও ওজনদার উপদেশ দেননি। দেবতা নয়—মনুষ্যোচিত গুণের বিকাশ, স্বামীজী আমাদের কেমন দেখতে চান, জগতের প্রতি আমাদের

দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে—এসব তাঁর নিজ পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভব দিয়ে মর্মস্পর্শী করে বলতেন, যা আমরা কয়েকজন সদ্যযুবক অবাক হয়ে শুনতাম। প্রতিটি ছোট ছোট কাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কাজ মুখ্য নয়, কাজের ভাবটিই মুখ্য। ভাব ঠিক থাকলে কাজটিও সুচারু হয়ে ওঠে। আর তাঁর কাছে ভাব তো একটাই, সেটি হচ্ছে, যা করি সবই ঠাকুরের কাজ। বলতেন, ''ওরে, চলার পথে পড়ে থাকা কাঁটাটি তুলে ফেলে দিলে কত বড় সেবা করা হয়!''

ঠাকুরের মালা গাঁথতে ভালবাসতেন। মালা তো সবাই গাঁথে, কিন্তু ফুলের সংখ্যা গুনে মালা গাঁথে কজন? বকুল গাছের তলায় চাদরে বিছানো অজস্র ঝরে পড়া বকুল ফুল, সেখান থেকে দু-হাজার ফুল গুনে তুলে, তাকে একটা গোড়ের মালার রূপদান করতেন নিবিষ্ট মনে। তাঁর সঙ্গে সংখ্যা গুনে ফুল তোলায় সাহায্য করতে যে এত আনন্দ আছে তাই বা কে জানত? আমার দীক্ষা নেওয়ার দ্বিধা, গুরু নির্বাচনে দ্বিধা, সব তিনি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ''ওরে এরকম ঋষির মতো সাধু তুই কোথায় পাবি?'' আমার দুর্বুদ্ধিকে তিনি ধিক্কার দিয়ে ধূলিসাৎ না করলে কোথায় পেতাম সেই ঋষিকে! এক অনাবিল ভালবাসা, যার জন্য তাঁর প্রতি এক অকৃত্রিম আপনবোধ, আর সেটা যে তাঁর সন্ন্যাসের অভিমানটুকুও নিঃশেষে ত্যাগ করার ফল তা কী করে বুঝব! যে-ভালবাসায় শেষশয্যায় শুয়ে পরম পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীকে তাঁর এক শিষ্যকে আপন করে নেওয়ার আন্তরিক অনুরোধ জানাতে পারেন, সে-ভালবাসার পরিমাপই বা কী করে করা যায়! বলতেন, ''তোরা সব ভক্তরা মিলে একপ্রাণ হয়ে থাকবি, ওটিই ঠাকুরের ভাবের প্রচার—'মোর মরণে তোমার হবে জয়/ মোর জীবনে তোমার পরিচয়।' তোদের জীবন দেখেই তো লোকে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হবে। শুধু দিনযাপন, থোড় বড়ি খাড়া করার জন্য ঠাকুরের ভক্তের জীবন নয়, তাহলে তার ইষ্টনাম নেওয়ার সার্থকতা কোথায়?'' চিঠিতে আশীর্বাদ করতেন, '' 'কুসুমের শোভা কুসুমের অবসানে/ মধুরস হয়ে লুকায় ফলের প্রাণে।' ঠাকুর মধুর রসে পূর্ণ করুন তোদের হৃদয়।'' তাঁর হৃদয়মাধুর্যে আজও আমরা আপ্লুত।

ওই শেষশয্যা থেকেই তাঁর শেষ কথাটি জানিয়েছিলেন, ''যাওয়ার আগে এই কথাটি জানিয়ে দিয়ে যাই/ যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।'' তারপর একটু থেমে বললেন, ''ওরে ভাগ্যে এই সঙ্ঘে এসে পড়েছিলাম।'' এ-সংসারকে যে মজার কুটি করে তোলা যায়, আর তার আনন্দময়তা অনুভব করতেই মানুষজন্ম, সেটি জানিয়ে দিলেন। আর সেইসঙ্গে এও জানালেন যে বহু সুকৃতিবলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসাগরে এসে পড়া যায়, আর সে-বোধের উন্মেষ হলে তবেই এই সঙ্ঘের প্রতি ঠিক ঠিক আনুগত্য আসে।

তিনি বাঁকুড়া মঠে থাকাকালীন মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী অদ্বয়ানন্দজী বা অর্ধেন্দু মহারাজ। খুব ফরসা, গম্ভীর মানুষ এবং ব্যবহারে আপাত কঠোর। ওই কঠোরতার কারণে তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিলই। খুব শৃঙ্খলাপরায়ণ, কাজে সামান্য ত্রুটি দেখলে তীব্র ভর্ৎসনা জুটত কপালে। আমার বুদ্ধি কম ছিল বলেই তাঁর বকুনি খেয়ে ভয় পেতাম খুব, কিন্তু ঠাকুরের দয়ায় কখনও তাঁর ওপর বিরাগ আসেনি। উৎসবের চিঠিতে ঠিকানা লেখা ও স্ট্যাম্প লাগানো হচ্ছে। এক ভক্তবন্ধুর সঙ্গে কাজ করছি। বন্ধুটি একটু তাড়াতাড়ি করার জন্য যে-কোনও জায়গায় স্ট্যাম্প লাগাচ্ছেন। ভাগ্য ভাল, আমি ডান দিকের কোণে একটু সময় নিয়ে একরকমভাবে স্ট্যাম্প লাগাচ্ছি। এমন সময় তিনি হাজির। বন্ধুটিকে এমন তাড়া দিলেন যে আমারই কেঁদে ফেলার অবস্থা। তাঁর কাছেই বুঝেছিলাম কাজের ফল ভেবে কাজ করলে কী হয়, আর কাজটিকেই গুরুত্ব দিয়ে

করলে তা কীভাবে ঠাকুরের পূজা হয়ে দাঁড়ায়।

জন্মাষ্টমীতে সমবেত গীতাপাঠ হত, আমরা কয়েকজন যেতাম আগের দিন। সকাল ন-টার সময় বসা হত। আমার ধারণা আমি বেশ গড়গড় করে পড়তে পারি, জিভে আটকায় না, তাই বেশ জোরে পড়ছি আর তা ক্রমশ উচ্চৈঃস্বরে পৌঁছেছে। হঠাৎ পড়া থামিয়ে এক প্রবল হুংকার—''এটা কী হচ্ছে? ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে গোটা জিনিসটাকে মাটি করে দিচ্ছ। সমবেত শব্দটার মানে বোঝো না?'' আমার ভেতরে যে-অহংকারের বেলুনটা ফুলে ছিল সেটা দুম করে ফেটে গেল। তার ফলে, তখনকার মতো হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেলেও, আশ্চর্যভাবে তারপর থেকে পাঠে আবৃত্তিতে আর পরস্পরে বেসুর হয়নি। এখনও চণ্ডী বা গীতাপাঠের সময় সেই কথা মনে পড়ে মন সতর্ক হয়ে যায়।

একই ঘটনা ঘটেছিল একবার বিমল মহারাজের কাছেও। তিনি কখনও বকতেন না, তবে একদিনের প্রবল বকুনিতে আমার এক পুরনো রোগ সেরে গিয়েছিল। আমি শ্রদ্ধাভাজন এবং সাধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিনয়ের ভারে কথা অস্পষ্ট করে ফেলতাম। একদিন ওইভাবে কিছু বলেছি, মহারাজ বুঝতে পারেননি। হঠাৎ তিনি আমাকে চমকে দিয়ে তীব্র ভর্ৎসনায় বলে উঠলেন, ''ওটা কীভাবে কথা বলা হচ্ছে! কথা হবে পরিষ্কার এবং সোজা, ইনিয়ে বিনিয়ে নয়। ওটা বিনয় নয়, নপুংসকতা।''

এ-প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ঈশ্বর মহারাজকে রাজা মহারাজ এক সাধুকে দেখাচ্ছেন, তিনি ধ্যান করে নেমে আসছেন। ঈশ্বর মহারাজ সভয়ে দেখছেন যে এক কিম্ভূত জীব সেই সাধুটির ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এমন সময় হরি মহারাজ সেই সাধুটির দিকে চেয়ে এমন ধমক দিলেন যে, সেই জীবটি লাফিয়ে পালিয়ে গেল। তামসিকতার যে রূপ আছে, আর তা সাধুর তীব্র ভর্ৎসনায় যে চিরতরে দূর হয়ে যায়, তার প্রমাণ পেয়েছি বহুবার।

ফিরে আসি অর্ধেন্দু মহারাজের কথায়। হয়তো বকুনি খাওয়ার ভয় সত্ত্বেও, তিনি ডাকলে যেতাম বলে তাঁর মনের কোণে আমার একটু জায়গা হয়েছিল। তার প্রমাণ পেলাম যখন পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজীর বাঁকুড়া আশ্রমে আসা স্থির হল। সেটা ১৯৭৬ সাল, আর তার আগের বছর আমার তাঁরই কাছে দীক্ষা হয়েছে। বড় মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, ''তোমার গুরুদেব আসছেন, এ-মঠে চারদিন থাকবেন, তুমি এই মঠের পক্ষ থেকে তাঁর সেবায় থাকবে। তার আগে যাও তাঁর ঘরটি পরিষ্কার করো, বাথরুমটি পরিষ্কার করে দেখে নাও কোথায় কী রাখতে হবে।'' কোথায় ঝুলঝাড়া থাকে, কোন কাপড়টি নিয়ে খাট পরিষ্কার করতে হবে, ট্রাঙ্ক থেকে বিছানা বার করে কোনখানে রোদে দিতে হবে এবং সব আবার গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার কথাও বলে দিলেন। খুব মন দিয়ে শুনে নিলাম, কারণ জানি আর দ্বিতীয়বার বলবেন না, আবার জিজ্ঞাসা করলে হয়তো দায়িত্ব থেকেই অব্যাহতি দিয়ে দেবেন। আমি স্বামীজীর ভাষায় 'সার্ভেন্ট ক্লাস'। খুব আনন্দে লেগে পড়লাম। সেবার খুব উতরে গেল, ফলে পরবর্তী দুবারও আমার ওপরই ভার পড়েছিল তাঁর সেবার। সাধারণত মঠের পক্ষ থেকে সন্ন্যাসী সেবক থাকেন তাঁর সেবককে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু, যাকে বলে প্রোটোকল ভেঙে, বড় মহারাজ আমাকে সে-ভার দিয়েছিলেন। বিমল মহারাজ তখন রায়পুরে। তিনি চিঠিতে জানালেন, ''গুরুর ঋণ শোধ হয় না, কিন্তু বড় মহারাজের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবি তাহলে ঋণ খানিক শোধ হবে।''

বাঁকুড়া মঠে তখন পুকুরের দিকে মুখ করে মূল মন্দির ও পুকুরঘাটের মাঝে একটি খড়ের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি ছিল। দুটি ঘর, পশ্চিমেরটিতে স্বামী সারদানন্দ থেকেছিলেন। সেই ঘরে বিভূতি মহারাজ থাকতেন, সন্ন্যাস নাম প্রত্যয়ানন্দ। অতি

উচ্চস্তরের শাস্ত্রীয় সংগীত গায়ক। এছাড়া নিজেই গান লিখতেন ও সুর দিতেন। কিন্তু সেগুলি রাগপ্রধান হওয়ায় সাধারণ গায়কের পক্ষে গাওয়া মুশকিল ছিল। নিজেও বলতেন, ''প্রত্যয়ানন্দের গান গাওয়া অত সহজ নয়।'' আশি সালের কনভেনশনে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ওপেনিং সেশনে, ''চুন চুন কংকর মহল বনায়ে লোগ কহে ঘর মেরা/ না ঘর মেরা না ঘর তেরা দুনিয়া রৈন বসেরা রে''—এই রাগাশ্রিত ভজনটি গেয়ে মাত করে দিয়েছিলেন। আমার গলায় একটু গান ছিল আর শাস্ত্রীয় সংগীতের ভক্ত ছিলাম বলে আমাকে খুব স্নেহ করতেন। মঠে গেলে তাঁর ঘরে একটু গান শোনা, গান গাওয়া এক আনন্দের ব্যাপার ছিল।

বাঁকুড়া মঠ তখন আগাছা আর জঙ্গলে ভর্তি। প্রাচীন আমগাছ, কাঁঠালগাছ, আরও বহুবিধ নানা গাছ যত্রতত্র ছড়িয়ে আশ্রমকে অন্ধকার করে রাখত। তিনি মঠের একটা পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। রাঙচিতের বেড়া চারপাশে, যেকোনও দিক দিয়ে আশ্রমে ঢুকে আশেপাশের দরিদ্র মানুষেরা এটা ওটা নিয়ে পালিয়ে যেত। চোর, ডাকাত তো ছিলই। সেসময়ে আশ্রম ও দ্বারকা নদীর মাঝখানে বসতি খুব কম, যা-ও বা ছিল তা ওই হতদরিদ্র মানুষদের ঝুপড়ি। তিনি দুর্গাপুরের বিভিন্ন টাউনশিপে ঘুরে ঘুরে ক্লাস করতে লাগলেন। ঘুরে ঘুরে মানে সত্যিই পায়ে হেঁটে, বাসে করে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর ক্লাসে অতিরিক্ত আকর্ষণ তাঁর গান। তাই লোকসমাগম হত।

তিনি অসম্ভব জেদ নিয়ে আশ্রমটি পরিচ্ছন্ন করে তুললেন। আশ্রমের গরু, গোয়ালঘর হল। পুরনো গাছ সব কেটে ফেলে নতুন গাছ নানা দেশ থেকে আনিয়ে লাগালেন—আম, জাম, লিচু, সবেদা, মুসুম্বি। তরকারিপাতির চাষ হতে লাগল—বেগুন, পটল, ঢ্যাঁড়শ, মাদ্রাজি ওল—যার এক একটির ওজন কুড়ি কেজি পর্যন্ত হত। চুঁচুড়ার ধান গবেষণাকেন্দ্রে কলার একটা গবেষণাকেন্দ্র ছিল। সেখান থেকে নানারকমের কলার চারা পুকুরের চারপাশে লাগালেন, পুকুরে মাছ ছাড়লেন, সর্বোপরি চারিদিকে বারো ফুট উঁচু পাঁচিল তুললেন। দুর্গাপুরের এ বি এল কোম্পানির ডগ স্কোয়াড থেকে একটি অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা নিয়ে এলেন, নাম দিলেন 'বেগম'। একটু বড় হতেই সে মঠের পাহারায় ছাড়া থাকত, তার গুরুগম্ভীর গর্জনে রাতে কারও ঢুকে পড়া সম্ভব ছিল না। অনেকের মতো আমারও তখন মনে হত সাধুর মঠে আবার এসব কী! কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, স্বামীজী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীকে সমাজের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে গেছেন তার উন্নয়নের জন্য। ঠাকুরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেও ঠাকুরেরই কাজে সিংহবিক্রম দেখানো শুধু লোকশিক্ষার জন্য। তার প্রমাণ পেলাম যখন তাঁর অন্য এক সেন্টারে বদলির আদেশ এল। নির্বিকার চিত্তে তাঁর আদরের বেগমকে ফেলে, হাতে গড়া আশ্রমের উন্নতির দিকে না তাকিয়ে চলে গেলেন।

তাঁর বদলে এলেন স্বামী একরূপানন্দ বা চিত্ত মহারাজ। ফরসা, মুণ্ডিতমস্তক, কাটা কাটা চোখমুখে তাঁকে বুদ্ধদেবের মতো লাগত। ইনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন। অল্পবয়স, স্নেহপ্রবণ, কথায় বার্তায় আচরণে এক আশ্চর্য মাধুর্য। খুব জপধ্যান করতেন। তাঁর কথামৃত ক্লাসের এক বিশেষত্ব ছিল যে, শুরুতে একটা প্রস্তাবনা করতেন। বলতেন, ''সবাই চোখ বুজে মনে মনে চলুন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যাই। সেখানে তাঁরই মুখ থেকে তাঁর কথা শুনব। গেটের পরে বাঁদিকে গাজিতলা পেরিয়ে প্রথমে মা ভবতারিণীকে দর্শন করি, প্রণাম করি, তারপর চলুন ঠাকুরের ঘরে গিয়ে বসি। ঠাকুরের ঘরে অনেকে বসে আছেন, মাস্টারমশাই পাপোশের ওপর বসে, পশ্চিমের দরজা দিয়ে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে, ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসে বলছেন।''—এইরকম ভাবে শুরু করে পাঠ করতেন ও মাঝে মাঝে

আলোচনা করতেন। অল্পবয়সি ছেলেদের খুব আকর্ষণ করতে পারতেন। ওঁর সঙ্গে অনেক জায়গায় যেতাম তাঁর ক্লাসে, আমায় ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন। বলতেন, ''আমি ছোটখাট মানুষ, আমি উপদেশ দিতে পারি না।'' তবে তার দরকার ছিল না, কথামৃতের ঘটনাবলির ধ্যান করা তিনিই শিখিয়েছিলেন। বেশ কয়েকবছর পর তিনি বদলি হন কাঁথি বা তমলুক, আজ আর মনে নেই, তবে সেখান থেকেও আমাদের কাছে আসতেন।

পূজনীয়া শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর স্মৃতিচারণে অনেকেই বলেছেন যে, তিনি বলতেন, ''আমরা কী ত্যাগ করেছি জান? স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ।'' ব্যাপারটা আমি এইভাবে বোঝার চেষ্টা করি। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছামতো কিছু করার স্বাধীনতা, যা আমাদের ক্ষুদ্র অহং থেকে আসে। এই ইচ্ছাটুকু সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের ইচ্ছায় মিলিয়ে দিতে না পারলে সঙ্ঘের সেবা ঠিক ঠিক করা যায় না। আর ভবিষ্যতের ভাবনা তো মানুষমাত্রেরই থাকে। কিন্তু যথার্থ সঙ্ঘভুক্ত হতে গেলে নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা ঠাকুরের ওপরে ছেড়ে দিতে হবে। এ-দুটির অভাবই সঙ্ঘত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এর একটা অন্য দিকও থাকতে পারে তা বুঝিনি। ঠাকুরের কথা বলতে গিয়ে চিত্ত মহারাজ তখন প্রায়ই কাশীতে মণিকর্ণিকায় ঠাকুরের দর্শনের কথা বলতেন—মহাদেব কেমন করে মৃত ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তি হয়। তাই মঠ কর্তৃপক্ষকে অনেকবার তাঁকে কাশীতে বদলি করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা যখন হল না, তখন তিনি নিজেই কাশীতে একটা বাড়ির অংশ ভাড়া নিয়ে বাস করতে থাকেন। কাশী গিয়ে আমি একবার তাঁর কাছে যাই। আমাকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, পূজনীয় আত্মস্থানন্দজীর চিঠি দেখালেন, যাতে তিনি অনেক স্নেহ দেখিয়ে তাঁকে ফিরে যেতে লিখেছিলেন। তিনি কথা রাখতে পারেননি বলে আন্তরিক দুঃখিত হয়েও তাঁর মুক্তির বিশ্বাস থেকে সরে আসতে পারেননি। সে-বিশ্বাসের জোর নিশ্চয়ই ছিল, তার কারণ আমি দেখা করে চলে আসার পর কিছুদিন বাদেই তাঁর দেহান্ত ঘটে।

এরপরে আমরা যাঁকে পেলাম তাঁর নাম শৈলেন মহারাজ, স্বামী শ্রেয়সানন্দ। বৃদ্ধ, খুব রোগা কিন্তু সচল। সচল বললাম কারণ ওই বয়সেও তিনি দিব্বি বাসে করে দুর্গাপুরে আমাদের কাছে আসতেন। প্রাচীনপন্থী, মহাপুরুষ মহারাজের আশ্রিত, পোশাকে আচরণে খুব সাধাসিধে। শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা পছন্দ করতেন না। বলতেন, ''শরীর এইরকমই, সে তার মতো আছে।''

প্রথমদিকে তেমন বুঝতাম না, কিন্তু ক্রমশ বুঝতে শুরু করলাম যে এই সাদাসিধে মানুষটির কাছে শেখার জিনিস অনেক। কত সামান্যে যে জীবন চলে যায় তা অবাক হয়ে দেখতাম। আসতেন একটি ছোট গেরুয়া ঝোলা নিয়ে। তাতে একটি কাপড়, গামছা ও ফতুয়া। হাতে একজিমা ছিল, খাওয়ার সময় চামচ ব্যবহার করতেন, কিন্তু সেটি জানা গেল খাওয়ার সময় পকেট থেকে একটি ছোট চামচ বার করতে দেখে। পরে তাঁর খাওয়ার সময় ঘরের চামচ দিলেও নিতেন না, বলতেন, ''আমার আছে।'' গলায় সুর ছিল, ঠাকুরের গান গাইতেন। আমাকে বলতেন, ''নাও ধরো।'' গান শুরু হলে উদ্দীপিতভাবে গাইতে গাইতে সবাইকে সঙ্গে গাইতে বলতেন। খুব জমে যেত। একটা শেষ হলেই বলতেন, ''আর একটা ধরো, ঠান্ডা হয়ে যাবে।'' সমবেত ভজন করার অভ্যাস তিনিই করিয়েছিলেন, এবং তিনি থাকলে তা এমন জমে যেত যে কয়েকদিন তার রেশ মনে থেকে যেত।

একবার মহারাজ এলেন স্বামীজীর তিথিপুজোর পর। নানা গল্প করতে লাগলেন। ভুবনেশ্বরে যখন ছিলেন সেখানে পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ

তখন ব্রহ্মচারী। তখনকার দৃপ্ত ভঙ্গিমা ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন দেখে মনে হত যে এর ভেতরে বিশেষ কিছু আছে। এইসব নানা পুরনো দিনের কথা হল।

তাঁর একজিমা মাঝে মাঝে খুব বাড়ত ও কষ্ট পেতেন। তাই আমাদের কাছে আসা বন্ধ করলেন। আমাদের তো বাঁকুড়া আশ্রমে যাওয়া-আসা ছিলই, তাই তাঁর সঙ্গলাভে ছেদ পড়েনি। একবার অনেকদিন যাইনি। একজনকে দিয়ে খবর পাঠালেন, ''অজয়ের কী খবর?'' আমি শুনে দৌড়লাম তাঁর কাছে। বিকেলে গিয়ে দেখি তিনি খুব আস্তে আস্তে প্রাইমারি স্কুলের মাঠে হাঁটছেন। দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর এক জায়গায় বসে বললেন, ''দেখো, এই আশ্রমে কেউ কখনও মরেনি; আমি কোথাও যাব না। এই আশ্রমেই দেহ রাখব।''

আমার কেমন একটা লাগল, হঠাৎ একথা কেন কে জানে? সন্ধ্যায় আরতি ও জপধ্যানের পর তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বিছানায় শুয়ে, আমি মেঝেতে বসে, বাইরে নিঃসীম অন্ধকার ও নীরবতা। এর মধ্যে তাঁর কথাগুলো যেন দৈববাণীর মতো শোনাচ্ছিল। উঠে আসার আগে শুধু বললেন, ''দেখো, যতটুকু ঠাকুরের দয়ায় এগিয়েছ তাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করবে, তার থেকে পিছিয়ে যেয়ো না।''

তখন কথাটির অর্থ ভাল না বুঝলেও পরে বুঝেছিলাম, এই সংসারস্রোতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতেও স্রোতের বিরুদ্ধে কী প্রবল লড়াই করতে হয়। এর দিন সাতেক পরেই খবর পেলাম তিনি এক রাতে দেহ ছেড়ে দিয়েছেন।

স্বামী নিগমাত্মানন্দজী, অমিয় মহারাজ বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দিরে পূজা করতেন। তিনি আগে বাঁকুড়া মঠে থাকায় তাঁর সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের সুবাদে আমাদের বেলুড় মঠে দুপুরটা কাটানোর এক সুব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। দুর্গাপুর থেকে গিয়ে প্রসাদ পেয়েই চলে আসা কষ্টকর হত। তিনি একবার আমাদের দেখে বললেন, ''প্রসাদ পাওয়ার পরে সোজা আমার ঘরে চলে আসবি।'' তিনি মন্দিরের উলটোদিকে প্রেমানন্দ মেমোরিয়ালের নিচে দক্ষিণের ঘরটিতে থাকতেন, যেখানে এককালে শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান শান্তানন্দজী শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন।

অমিয় মহারাজ সম্পূর্ণ ভানহীন, সাধুসুলভ দূরত্বহীন, ডাকাবুকো সাধু। তাঁর বৈশিষ্ট্য তাঁর অদ্ভুত শিল্পবোধ। স্বামীজীর বেদি রোজ এক-একরকমভাবে সাজাতেন। কোনওদিন ফুলের কার্পেটের মধ্যে লেখা 'বি অ্যান্ড মেক', কখনও 'অ্যারাইজ অ্যান্ড অ্যাওয়েক' বা 'বহুজনসুখায়'। এছাড়া ফুলদানির শিল্প তো ছিলই। তাঁর সহায়ক ছিল বেলুড়ের বস্তির ছোট ছোট ছেলেরা। তারা প্রায় সবসময়ই তাঁর ঘরে ভিড় করে থাকত। এদের বশ করার কী মন্ত্র তাঁর ছিল জানি না, তবে মনে হয় তাঁর খোলা পাতার মতো চরিত্রই সাধারণের বিশ্বাস অর্জন করত।

এটি বিশেষ করে অনুভব করেছিলেন আমাদের এক ভক্তবন্ধু। পূজনীয় বিমল মহারাজকে ঘিরে আমরা কয়েকজন তখন একসঙ্গে ঘুরি ফিরি। সে-বন্ধুটি অনেককাল পরে অমিয় মহারাজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ''১৯৬৮ সালে বাঁকুড়া মঠে প্রায়ই যাই। তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করি। তিনি একদিন আমায় ডেকে বললেন, 'হ্যাঁরে, আমার কাছে আসিস বটে তবে আমি তো সে-সাধু নই। শোন, ওই যে ডিসপেনসারিতে ঢুকতে বাঁদিকে ঘরটি পড়ে, ওখানে দেখ একজন বৃদ্ধ সাধু থাকেন, সাধুসঙ্গ করতে চাস তো তাঁর কাছে যা।' তাঁর প্রেরণাতেই বিমল মহারাজকে পেয়েছিলাম, তাঁর কাছে এ-ঋণ শোধ হওয়ার নয়।''

বেলুড়ে তাঁর পাশের ঘরটা খালি ছিল তখন, আমরা প্রসাদ পেয়ে এলে সেটি খুলে দিতেন। অবশ্য সে-ঘরে বিশ্রাম হত না, তাঁর ঘরেই মেঝেতে নানা কথায় কেটে যেত। আবার সেই সুযোগে

স্বামীজীর মন্দিরের পিছনে গঙ্গার ধারে ইচ্ছে হলে বসে জপ করা চলত। তিনি যতদিন বেলুড় মঠে ছিলেন ততদিন মঠে সারাদিন কাটানোর দেদার স্বাধীনতা পেতাম।

এরপর তিনি তমলুকে বদলি হয়ে যান। তিনি বাঁকুড়া মঠে থাকতেও কাঁধে করে ভারি ব্যাগ বয়ে ঘুরে বেড়াতেন ভক্তদের বাড়ি বাড়ি, স্বামীজীর বই বিক্রি করতেন। তমলুক থেকে তিনি দুর্গাপুরে আমাদের বাড়ি আসা শুরু করেন দুটি বিশাল ব্যাগভর্তি বই কাঁধে করে। সকালে আসতেন, খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রামের পর বিকেলে কোনও বই থেকে পাঠ করে সঙ্গে আনা বইগুলি ভক্তদের দিয়ে বলতেন, ''স্বামীজীর বই কিনে পড়লে শুধু নিজের আত্মিক উন্নতি হয় না, গরিব আশ্রমের সাশ্রয় করে সঙ্ঘের সেবা করা হয়।'' শেষে আমাদের বাড়িটি একটি বইয়ের দোকান হয়ে গেল। উদ্বৃত্ত বই ফিরিয়ে না দিয়ে রাখা থাকত। মাসভর বিক্রি হলে পরের মাসে তার হিসেব মিটিয়ে নতুন বই রাখা হত। 'স্বামীজীর কাজ' এই বিশ্বাসে তিনি এর জন্য প্রচুর কায়িক পরিশ্রম করতেন। কারও কোনও সমালোচনা করলে ধমক দিয়ে বলতেন, ''সবাই তোর মতো ধম্মো ধম্মো করবে নাকি?''

একদিনের ক্লাসে ত্যাগের কথায় উত্তরাখণ্ডের এক গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পটি এইরকম—এক সাধুর কাছে প্রতিদিন বিকেলে ভক্তদের আসর বসে। সাধুটি সৎকথা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করেন। কয়েকদিন ধরে একজন শেঠ আসছেন, কিন্তু যেখানে তিনি বসেন সেখানে সাধুটির নজর পড়ে না। অতএব তিনি একটু আগে এসে একদম সামনে বসতে লাগলেন। কিন্তু সাধুটি তাঁর দিকে তাকানই না, অন্য কারও দিকে তাকিয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শেঠজী সাধুটির মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে, সেই সস্তার যুগে একদিন দশ টাকার নোটে হাজার টাকার এক বান্ডিল তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। সাধুটি চোখের কোণ দিয়ে তা দেখে বাঁ পায়ের এক লাথিতে তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। শেঠজীর অভিমানে খুব লাগল, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, ''মহারাজ, হাজার রূপেয়া দেকে প্রণাম করনে বালা ভকত্ আপকো জ্যাদা নেহী মিলেগা।'' শুনে সাধুটি উত্তর দিলেন, ''আরে ছোড়, হাজার রূপেয়া মে লাথ মারনে বালা সাধু তুঝে এক ভি নেহী মিলেগা।'' বলা বাহুল্য সে-শেঠজীর অর্থের অভিমান দূর হয়ে গিয়েছিল।

অমিয় মহারাজের চোখ ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। পুরীতে চক্রতীর্থের আশ্রমে মোহন্ত হয়ে কিছুদিন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে এক বিকেলে। এক সঙ্গী তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছেন কারণ তিনি তখন সম্পূর্ণ অন্ধ। দেখে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। পরিচয় দিয়ে প্রণাম করার পর দেখলাম তাঁর কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই, সেই হইহই করা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। সবার খবর জিজ্ঞাসা করে বললেন, ''বামুনমুড়া যাচ্ছি, শেষকটা দিন গুরুস্থানে কাটাই।'' মনে পড়ল একবার তিনি আমাকে 'শঙ্করানন্দ গল্পকথা' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। নিজের ভাবে স্বামীজীর কাজ করায় বিশ্বাসী মহারাজ বুক ফুলিয়ে চলে গেছেন স্বামীজীর শ্রীচরণে আজ অনেকদিন।

জয়রামবাটীতে আমরা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে উৎসবে যেতাম। বৃদ্ধ কিশোরী মহারাজকে দেখেছি, তখন রামময় মহারাজ অধ্যক্ষ। কিশোরী মহারাজের দেহত্যাগের কিছুদিন পর রামময় মহারাজও অবসর নিয়ে সেখানেই রইলেন, অধ্যক্ষ হয়ে এলেন হরিপদ মহারাজ, স্বামী প্রেমরূপানন্দ। এইসময় রামময় মহারাজকে কয়েকবার দুর্গাপুরে আমাদের কাছে আনতে পেরেছিলাম। এইসব প্রাচীন সাধুদের জীবনযাপনের স্বাভাবিক কৃচ্ছ্রতা দেখে অবাক হতাম। চা খেতেন না; সকালে, দুপুরে আর রাতে খাওয়া। মাঝে কিছু খেতেন না, কোনও ভক্ত

কিছু দিলে, উপরোধে কোণা ভেঙে জিভে ঠেকাতেন মাত্র। আর আমাদের সেই অল্পবয়সে, নবীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে তার অভাব দেখে মনে সমালোচনার ফুট উঠত। যুগের পরিবর্তনে জীবনধারার পরিবর্তন স্বাভাবিক, কিন্তু কৃচ্ছ্রতার মূল অনাসক্তিতে, এটি বোঝার মতো মানসিকতা আমাদের তখনও তৈরি হয়নি।

প্রথমবার মহারাজ এসেছেন আমাদের কাছে। যথারীতি ছোট ঝোলাটিতে একটি ফতুয়া, একটি কাপড় ও একটি সেলোফেন কাগজে মোড়া গামছা। বুঝলাম স্নান করেই বেরিয়েছেন তাই গামছাটি ভিজে। সেটি বার করে রোদে মেলে দিতে গেছি, তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ''মেলো না মেলো না, মা বলেছেন গামছা যত শুকোবে গায়ের রক্তও তত শুকোবে।'' আমি অবাক! মহারাজ বিজ্ঞানের ছাত্র, যুক্তিবাদী। শ্রীশ্রীমা কখন, কী পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি বলেছেন সেটি কোনও বিচার না করে এরকমভাবে কেউ সারাজীবন পালন করতে পারেন তা কল্পনাও করতে পারিনি। প্রাচীন সাধুদের কাছে শুনেছিলাম পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলতেন, ''আমরা যা বলি তা বিচার করে নিবি, কিন্তু মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ) কিছু বললে তা বিনা বিচারে পালন করবি।'' মা বলেছেন অতএব তা ধ্রুব, এই বিশ্বাসকে সারাজীবন ধরে রাখা যে সম্ভব, তা রামময় মহারাজকে না দেখলে বিশ্বাস হত না। শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করা তাঁর হাত দুটি যখন মাথায় স্পর্শ করতেন, কল্পনা করতাম মায়ের শ্রীচরণের ছোঁয়া পেলাম। তাই কারণে-অকারণে প্রণামের চেষ্টা করতাম। তিনিও কখনও নিরাশ করেননি। গোলাপের কলমের ব্যাপারে খুব দক্ষ ছিলেন। আমাদের এক ভক্তের বাগানে গিয়ে এ-বিষয়ে বলছেন, ''এখন একটা গাছে এক-এক ডালে এক-এক রঙের গোলাপ ফোটাতে পারি।'' একজন জিজ্ঞাসা করল, ''একই ডালে পারেন না?'' মহারাজ বললেন, ''ওটি ঠাকুর পারেন।''

সন্ধ্যায় মায়ের কথা বলার সময় তাঁর মায়ের সঙ্গে রুটি বেলার কথা উঠল। বললেন, ''একসঙ্গে তিন খানা রুটি বেলতে পারতাম।'' একজন উৎসাহী মহিলা বললেন, ''আমাদের শিখিয়ে দিন।'' মহারাজ বললেন, ''আটা মেখে নিয়ে এসো।'' আশির ওপর বয়স, মাখা আটায় লেচি করে আটা ছড়িয়ে, একটির ওপর একটি লেচি রেখে সুন্দর গোল রুটি বেলে ফেললেন। মেয়েরাও উৎসাহভরে চেষ্টা করতে লাগলেন। মায়ের ছেলের কাছে এই প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা দিয়ে সেদিন মায়ের ক্লাস শেষ হল।

একবার জয়রামবাটী গিয়েছি, সেবার সঙ্গী কেউ ছিল না। আমাদের থাকার নির্দিষ্ট স্থান ছিল তখনকার সাধুনিবাসের পেছনে, একটি মাটির দোতলায়। একতলায় প্রভাত মহারাজ থাকতেন, দোতলার টানা ঘরটিতে আমরা স্বেচ্ছাকর্মীর দল থাকতাম। তখন অত পাঁচিল, গেটের বালাই ছিল না। পুকুরের পাড় দিয়ে হেঁটে যখনই আসি, দোতলার ঘরে নিজের পুঁটুলি ফেলে মাকে প্রণাম করতে যেতাম, তারপর সাধুদের প্রণাম। সাধুনিবাস বলতে তখন একতলা ছোট ছোট কয়েকটি একসার ঘর। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা দোতলা পাকা বাড়ি, যার একতলায় কিশোরী মহারাজকে জীবদ্দশায় থাকতে দেখেছি। তারপর সেখানে রামময় মহারাজ ও হরিপদ মহারাজ থাকতেন। রমণীবাবু নামে একজন থাকতেন, তখন অতি বৃদ্ধ, খুব জপ করতেন। এছাড়া আরও দুজন বয়স্ক মানুষ থাকতেন, যাঁদের আমরা দাদা বলতাম—সত্যদা ও শিবুদা। এর মধ্যে শিবুদা ছিলেন শ্রীসারদা মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিনী শ্রুতিপ্রাণামাতাজীর ভাই। এঁরা সবাই কিশোরী মহারাজের আমলের স্বেচ্ছাকর্মী।

সেবার ভরদুপুরে হাজির হয়েছি, কোনও কারণে রাস্তায় দেরি হয়ে গেছে। সত্যদা দেখেছেন আমি এসে দোতলার ঘরে ঢুকছি। আমি পুঁটুলি নামিয়ে ঘরে রাখা মাদুর পেতে জায়গা করছি, এমন সময়

তিনি একটা থালায় একটু ভাত, ডাল আর তরকারি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে হাজির। আমি এই বিশ্রামের সময় তাঁকে কষ্ট করতে দেখে অস্বস্তি প্রকাশ করায় বললেন, ''ওরে আমি ঘর থেকে দেখতে পেলাম তুই অবেলায় এসে উঠেছিস। মায়ের বাড়ি এসে তুই না খেয়ে থাকবি? অল্প করে এখন খা, বিকেলে মুড়ি খাওয়াব ভাল করে।'' মায়ের আদর তখন যেন স্পর্শযোগ্য ছিল। কাঁকুড়গাছি ছাড়া, এত ভালবাসায় ভরা ঘরোয়া পরিবেশ আর কোথাও পাইনি।

মঙ্গলারতির একটু আগে হাজির হয়ে বসতাম। ঠিক শাঁখ বাজার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে পূজনীয় রামময় মহারাজের গলার আওয়াজ শোনা যেত। তিনি হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে অম্বাস্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে আসতেন। চারপাশে তখন বিশাল বিশাল গাছ, মন্দিরে গোবর গ্যাসের মিটমিটে আলো, আলো-আঁধারি এক অতি গম্ভীর পরিবেশ। লণ্ঠনের দোলায় আশেপাশে ছায়াগুলো ঠিক আবৃত্তির তালে তালে দুলছে। তিনি আবৃত্তি করতে করতে মায়ের মন্দিরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে বসলেন। আরতি শেষ হল, প্রদীপের তাপ নিয়ে আবার একটি শক্তিস্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে ফিরে চললেন। গলার স্বর যেমন দূর থেকে শুরু হয়ে কাছে এসেছিল ঠিক তেমনই আবার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে লাগল, আর এই অসম্ভব চঞ্চল মনগুলো কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ল। এ-অনুভব তখনকার যেকোনও ভক্তের কাছেই শুনতে পেতাম। এই ভাবের রেশ বেশ কয়েক ঘণ্টা থেকে যেত মনে।

সকালে সাধুভক্ত সবাই একসঙ্গে মুড়ি খাওয়া হত। মন্দিরের পাশেই একটা ছোট ঘর, সেখানে একজন মহারাজ থাকতেন, বিভূতি মহারাজ। তাঁকে ছোট মহারাজ বলত সবাই, আর কিশোরী মহারাজকে বড় মহারাজ বলা হত। সারদানন্দজীর আশ্রিত ছিলেন, শরীর ভাল নয়, খুব নিম্নস্বরে কথা বলতেন। তিনি অনেক পুরনো দিনের কথা বলতেন, তবে লিখে না রাখায় তার প্রায় কিছুই মনে নেই। তাঁর ঘরের পরে একটা টিনের চালা, সেখানে এক অংশে মুড়ি ভাজা হত, আর লম্বা বাকি জায়গাটায় আমরা সবাই মুড়ি আর চা খেতাম। মায়ের ভাইপো বিজয়বাবু রোজকার সদস্য ছিলেন। সেদিন ঘুগনি হয়েছে কিন্তু তা ভাল সেদ্ধ হয়নি। রামময় মহারাজ বিরক্ত হয়ে বলছেন, ''কী রেঁধেছ, চিবোনো যায় না।'' খাওয়ার পরে হরিপদ মহারাজ আমাকে তাঁর স্বাভাবিক মিষ্টিস্বরে ডেকে বলছেন, ''তুমি কাল ঘুগনি রাঁধতে পারবে? আমাকে একজন একটা পাঁচ লিটারের প্রেসার কুকার দিয়েছিল, যদি ব্যবহার করতে পার তো দেখো।'' তখন প্রেসার কুকারের ব্যবহার ঘরে ঘরে তেমন প্রচলন হয়নি। ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়িতে একটি প্রেসার কুকার ছিল, তাই তার ব্যবহার জানা ছিল। তাছাড়া আগেই বলেছি আমি সার্ভেন্ট ক্লাস, তাই পারি বা না পারি, বলে দিলাম ''হ্যাঁ।'' ভাঁড়ারে মটর নেই, গ্রামেও পাওয়া যায় না। বাস ধরে চলে গেলাম আরামবাগ। মটর কিনে এনে ভিজিয়ে রেখে দিলাম। পরদিন ভোরে ঘুগনি তৈরি করে একটা কাঁসিতে মুড়ি, আর একটা বাটিতে ঘুগনি নিয়ে রামময় মহারাজের ঘরের দরজায় হাজির। তিনি জিজ্ঞাসু চোখ তুলে চাইতেই, বললাম, ''ছোটা হাজরি মহারাজ।'' ছোটা হাজরি খানসামাদের ভাষা, সাহেবি কেতার বাড়িতে। তিনি মুচকি হাসলেন। আসন পেতে সামনে ধরে দিলাম। তিনি খাচ্ছেন আনন্দে আর আমি একটা পাখা নিয়ে বাতাস করছি, এ-সুখস্মৃতি আমার অমূল্য সম্পদ।

প্রেমরূপানন্দজী—হরিপদ মহারাজ সার্থকনামা ছিলেন, প্রেমের প্রতিমূর্তি। এমন মিষ্টি করে কথা বলতে কাউকে দেখিনি। এমন মিষ্টি করে 'অজয়' বলে ডাকতেন যে সব কিছু করতে প্রস্তুত থাকতাম। মায়ের পুরনো ঘরটি মাত্র পাওয়া গেছে তখন। সে-

ঘরটির উদ্বোধন করবেন পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। তিনি এসেছেন, আমরা ছোটাছুটি করে নানা কাজ করছি। ফিতে কাটার জন্য একটি নতুন কাঁচি রাখা আছে। আমি একটি সুন্দর পাত্রে সাজিয়ে রেখেছি। তার একটা প্রশংসা শুনব না? তাই হরিপদ মহারাজকে দেখালাম। তিনি কাঁচিটা হাতে তুলে চালিয়ে দেখলেন আর তাঁর স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বললেন, ''এটি নতুন কাঁচি তো, ভারি কড়া, এর মাঝখানে একটু তেল দিয়ে দাও, বুড়ো মানুষ মহারাজের আঙুলে লাগবে।'' ভালবাসা না থাকলে বাইরের চাকচিক্যের কোনও দাম নেই, এটি মনে জোর এক ধাক্কা দিয়ে গেল। উৎসব ছাড়া অন্য সময় গেলে ঠাকুরভাঁড়ারে কাজ করতাম। পূজারি বীরেশ মহারাজ খুব হাঁকডাকে সাধু, পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলতেন। নিজের কাছে প্রসাদি সন্দেশ রাখতেন, আর তাঁর নিজের আদরের ভঙ্গিতে ডেকে খাওয়াতেন। তখন ফ্রিজের যুগ নয়, তাই প্রায় সবসময়েই খারাপ থাকত। সেটি হাতে নিয়ে 'পরে ঘরে গিয়ে খাব' বললে হবে না, সামনে খেতে হবে। তাই তিনি ডাকলে পালিয়ে যেতাম 'কাজ আছে' বলে। হরিপদ মহারাজ শুনে মজা পেয়ে খুব হাসতেন।

ভাঁড়ারে কাজ করতেন ব্রহ্মচারী মুরারি মহারাজ, তিনি মায়ের ভোগ তুলতেন। ভোগ হয়ে গেলে তা নামানো অন্যে করতে পারত, তবে ব্রাহ্মণশরীর হতে হবে। আমার ইচ্ছা নামাই। মুরারি মহারাজের পরামর্শে পৈতেটি উড়ানির পাশ দিয়ে বার করে রেখে বীরেশ মহারাজকে বললাম। তিনি পৈতে দেখে অনুমতি দিলেন। শনি-মঙ্গলবারে মাকে মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজা দেওয়া হয়। তখন রান্নাঘরে কয়লার উনুন, আর মায়ের ভোগের ভাঁড়ারে গোবর গ্যাসের উনুন। সেই গ্যাসে মায়ের জন্য তেলেভাজা ভাজতাম বীরেশ মহারাজের প্রশ্রয়ে।

মায়ের ভাঁড়ারে বাইরের কোনও বাসন ঢুকত না। কোনওভাবে তা বেরিয়ে গেলে আর ভাঁড়ারে নেওয়া চলত না। সিংহবাহিনীর প্রসাদি মাংস এলে তা আলাদা উনুনে ও বাসনে রাঁধা হত, প্রসাদি মাংসে পেঁয়াজ দেওয়ার চল নেই। একবার আমাদেরই এক ভক্ত, কোনও কারণে বলির মানত করে সিংহবাহিনীকে পাঁঠা দিয়েছেন, আর সমস্তটাই মঠে দিয়ে দিয়েছেন। হরিপদ মহারাজ আমাকে বললেন, ''তুমি পেঁয়াজ দিয়ে এটি রাঁধতে পারবে?'' আমি বললাম, ''মহারাজ, প্রসাদি মাংস তো মায়ের বাড়িতে পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধা যায় না।'' তিনি বললেন, ''মায়ের ছেলেরা খেতে চাইলে কি তিনি বারণ করতেন? তুমি রাঁধো, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'' রান্নাঘরে টিনের আড়াল করে দিলেন। আমি জীবনে কখনও সাত-আট কেজি মাংস রাঁধিনি, কিন্তু মায়ের নাম করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দই-পেঁয়াজ দিয়ে ভিজিয়ে রেখে পেতলের হাঁড়িতে বিকেল থেকে শুরু করে রাত আটটায় নেমে গেল। খাবার ঘণ্টা পড়ে গেলে কান পেতে রইলাম কে কী বলে। হরিপদ মহারাজ খুব খুশি। আমরা এদেশের লোক, সব রান্নাতেই একটু মিষ্টি দিই। একমাত্র একজন খুব কট্টর পূর্ববঙ্গের ব্রহ্মচারী বললেন, ''ভালই, তবে মিষ্ট কইরা ফ্যালাইছেন।'' এখন ভাবি, দুমদাম এগিয়ে পড়তাম বলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় জীবনে, যা রোমন্থনে এখন আনন্দ দেয়।

পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজ জয়রামবাটী আসবেন। আমি আগের দিন থেকে হাজির। মহারাজের হয়ে আসিনি, হরিপদ মহারাজের হয়ে এসেছি বলে পূজনীয় মহারাজ আমাকে দেখে হরিপদ মহারাজকে বলছেন, ''তুমি আমার এ-ছেলেটিকে হস্তগত করেছ দেখছি।'' মহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টস্বরে বললেন, ''না মহারাজ, ও এসে মায়ের অনেক কাজ করে।'' খুব গরমের দিন তখন, সারাদিন প্রবল পরিশ্রমের পর ঘরে ঘুম হওয়া মুশকিল। রাত এগারোটার পর মায়ের ভাঁড়ারের

ছাতে একটা মাদুর আর মশারি নিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে শুতে যেতাম। আবার রাত সাড়ে তিনটেয় উঠতে হত, কিন্তু সে-ক্লান্তি ছাড়িয়ে এক মহা আনন্দ বিরাজ করত। রাতে প্রসাদের পর পূজনীয় মহারাজের কাছে সবাই বসতাম। হরিপদ মহারাজ বললেন, ''মহারাজ, আপনি আসায় যা লোকসমাগম হয়েছে তা মায়ের উৎসবকে ছাড়িয়ে গেছে। একটা আলুর গুদাম ছিল, ভক্তদের প্রবল আগ্রহে সেটিও খুলে দিতে হয়েছে, তাতে কষ্ট করেও তারা থাকতে রাজি।'' পূজনীয় মহারাজ মিটিমিটি হেসে বললেন, ''কত আমদানি হল সেটা বলো!'' সবাই খুব হেসে উঠল। তখন হরিপদ মহারাজ বললেন, ''মহারাজ, মায়ের কৃপায় তাঁর চাষবাড়িতে যা হয় তাতে যত লোকই হোক দুমুঠো ভাতের অভাব হয় না।'' মহারাজ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ''তাইতো, মা এই চুষিকাঠি দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রাখেন, পাছে আমরা তাঁকেই চেয়ে বসি। এইসব ঐশ্বর্য নিয়ে আমরা তাঁকে ভুলে দিব্যি দিন কাটাই।''

পরদিন কামারপুকুর যাওয়া হবে। সকালে জলখাবারের পর মহারাজ আমাকে তাঁর সঙ্গে কামারপুকুর যেতে বললেন। হরিপদ মহারাজ বললেন, ''মহারাজ, ও আমার সঙ্গে গাড়িতে যাবে, ফিরে এসে আবার বিকেলে পাঠিয়ে দেব।'' গাড়িতে যাওয়ার সময় হরিপদ মহারাজ বলছেন, ''কাল মহারাজ আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, সত্যিই তো তাঁর ঐশ্বর্য নিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।'' আমি এক অপরিণত অর্বাচীন ভক্ত; তার কাছে নিজের ওপরে এই দুর্বলতার দোষ চাপিয়ে নিয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা যে কতখানি মহত্ত্বের পরিচয় তা আজ বুঝতে পারি।

এরপর যতবার পূজনীয় মহারাজ এসেছেন ততবারই জয়রামবাটীতে হাজির থেকেছি, শুধু শেষবার ছাড়া। চিঠি দিয়ে তো কখনও যেতাম না, কিন্তু শেষবার কেন জানি না, 'যাচ্ছি' বলে চিঠি লিখেছিলাম। অসংখ্য চিঠি যে-ব্রহ্মচারী বেছেছিলেন তিনি না জেনে আমার যাওয়া নাকচ করে দিয়েছিলেন। আমার একটু অভিমান হল, গেলাম না। মহারাজ নেমেই আমার খোঁজ করলেন। হরিপদ মহারাজ জানেন না কেন যাইনি। কোনও পরিচিত ভক্ত বলে দিল যে, আমাকে যেতে মানা করা হয়েছে। বিব্রত হরিপদ মহারাজ সব মিটে গেলে আমাকে চিঠি দিলেন এত মধুর ভাষায় যে, আজও পড়লে মন ভার হয় নিজের অভিমানের জন্য। লিখেছিলেন, ''তুমি আমায় একটুও ভালবাস না তাই চিঠি লিখে সম্মতি চেয়েছ। আমি তো পড়ে চিঠিতে সই করার সময় পাই না, তাই এরকম হয়েছে। যাইহোক তুমি সত্বর একবার আসবে, না হলে আমার ভারি মন খারাপ হবে।'' আমার দুর্দৈব, আজ-কাল করতে করতে মহারাজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর শরীরও চলে গেল। এ-আক্ষেপ আমার আজও যায়নি।

রামময় মহারাজ যখন জয়রামবাটীর অধ্যক্ষ ছিলেন তখন মাতৃমন্দিরে বেশ কয়েকজন সাধু ছিলেন যাঁরা মঠভুক্ত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে স্বামী শ্যামানন্দ নামে এক সাধু ঠাকুরভাঁড়ারে কাজ করতেন, পূজারি বীরেশ মহারাজের সহকারী হিসাবে। তাঁকে আমরা শশাঙ্ক মহারাজ নামে জানতাম। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে কয়েকজন তখন অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শশাঙ্ক মহারাজও তাদের সঙ্গী হতে চাইলেন এবং তারাও তাঁকে আনন্দের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাল। যাত্রার কয়েকদিন আগে মহারাজ এলেন দুর্গাপুরে এক ভক্তের বাড়িতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ সম্বল করে। তাতে দু-একটি শীতবস্ত্র ও কয়েকটি জামাকাপড়। এত সামান্য জিনিস নিয়ে ওই ঠান্ডায় যাবেন, এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করায় বললেন, ''কেন? একটা মোটা চাদর রয়েছে, একটা ফুল

সোয়েটার রয়েছে, আর কী চাই?" এই সরলপ্রাণ মানুষটিকে যত দেখেছি ততই অবাক হয়েছি। এই অবাক হওয়া চরমে পৌঁছল যখন জানা গেল যে, তিনি জয়রামবাটী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে এসেছেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর সেখানে সেবায় ছিলেন অথচ চলে এলেন একটিমাত্র ক্যাম্বিসের ব্যাগ সম্বল করে। জমার ঘরে পার্থিব বস্তু কিছুই নেই, কারণ থাকলেও তাতে আত্মবুদ্ধি জন্মায়নি। আর এই অবাক করা নিস্পৃহতার জন্যেই হয়তো মাতৃমন্দির চিরকালের মতো ছেড়ে আসতে কোনও বিষাদের চিহ্ন নেই মুখে। তীর্থযাত্রার পর বন্ধুদের মুখে রাস্তায় তাঁর বহু বিষয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার কথা শুনতাম, যা তারা মজা করে বলত। এক জায়গায় মশার উপদ্রবের জন্য তাঁকে একটা ওডোমস দিয়েছে এক ভক্ত। তিনি সরল মুখে জিজ্ঞাসা করছেন, ''হ্যাঁরে, এটা কি খেতে হয়?" শুনে তাদের হাসি থামে না। অমরনাথ থেকে ফেরার পর কয়েকটি আশ্রমে ঘুরে শেষে আঁটপুর মঠে পূজার ভার নিয়ে রইলেন। আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠভুক্ত হল, তবে তাঁকে আর চলে যেতে হয়নি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেখানেই। তাঁর সামনে ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বললে একটু শ্লেষ করেই বলতেন, ''মুখে বলা সোজা।" প্রথমে এটি যেন নিরুৎসাহ করার চেষ্টা বলে মনে হলেও পরে বুঝেছিলাম যে, আমাদের বইয়ে পড়া জ্ঞান তাত্ত্বিক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টার অভাবের জন্যই ওই শ্লেষটুকু। এখনও তাঁর জাগতিক নিস্পৃহতাপূর্ণ অমলিন হাসিটুকু মনে পড়লে, ওই সারল্য ও অনাসক্তির অধিকারীকে বড় দূরের হাতছানি বলে মনে হয়।

বিমল মহারাজ রায়পুরে যাওয়ার পর প্রথম রায়পুর যাই আর আত্মানন্দজীর সঙ্গে পরিচয় হয়। পূজনীয় ভূতেশানন্দজীর রায়পুর হয়ে সমস্ত ট্যুরগুলোতে আমি থাকতাম। ফলে আত্মানন্দজীকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়। এরকম সবদিক থেকে বড় মাপের মানুষ আমি দেখিনি। চেহারায়, হাসিতে, গলার স্বরে, হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে, দুহাত বাড়িয়ে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতায় এক অনন্য সাধু। অ্যাপ্ল্যায়েড ম্যাথামেটিক্স্-এ গোল্ড মেডালিস্ট হয়ে মাস্টার্স করে, আই এ এস পরীক্ষায় পাস করে সরকারে যোগ না দিয়ে, রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন। এসবের ভার তাঁকে কখনও বইতে দেখিনি, সে-হিসাবে গুণহীন আমার সঙ্গে আলাপে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। একদিন বলছেন, ''জানিস, বাবা দুঃখ করে আমায় বলছেন, 'তুলেন (তুলেন্দ্র পূর্বাশ্রমের নাম) তুই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হতিস রে।' আমি উত্তরে বললাম, 'বাবা দুঃখ কোরো না, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা আমায় এসে প্রণাম করে।' " ভাল লিখতেন, গান গাইতে পারতেন ভাল। রঙ্গনাথানন্দজীর বক্তৃতা যেমন জনগণকে আবিষ্ট করে রাখত, তেমনই হিন্দি বক্তৃতায় তিনি ছিলেন মাস মেসমেরাইজার। আমি ওঁর বেশ কিছু বক্তৃতা শুনেছি যেখানে তিন-চার হাজার লোক নিঃশব্দে তাঁর কথা যেন গিলছে। আমাকে বলতেন, 'ঠস্‌সু'। প্রায় একমাস বা তার বেশি সফরসূচির সবটাই তৈরি করে রাখতেন। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল খুঁটিনাটি বিষয়েও, যেমন গাড়িতে যাওয়ার সময় কে কোথায় বসবে সেটিও ঠিক করা থাকত। আমি যেখানে সেখানে শুয়ে পড়তে পারতাম বলে বলতেন, ''ও ঠস্‌সু, ওর জন্যে চিন্তা নেই, ও ঠিক নিজের ব্যবস্থা করে নেবে।" খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং সবসময়ই ঠিকঠাক হত, তাই রাস্তায় কোনও অসুবিধেয় পড়লে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ছিল। এখন নারায়ণপুর আশ্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই আশ্রমটির রূপায়ণ এঁর হাতেই। পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীকে আত্মানন্দজী নারায়ণপুর আশ্রমে নিয়ে গেছেন। সঙ্গে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে-আশ্রম তখন সবে গড়ে উঠছে। খুব

সম্ভবত মে মাস, প্রবল গরম। নারায়ণপুর আশ্রম থেকে ফিরে আসার পথে আত্মানন্দজী ঠিক করলেন, রোদ কমলে মহারাজ বেরোবেন ও মাঝে পথে এক বনবাংলোতে রাত কাটানো হবে। আত্মানন্দজী আমাকে আর এক সেবককে নিয়ে বেরোলেন ঘর ঠিক করে রাখতে। কিন্তু সন্ধ্যায় পৌঁছে দেখা গেল, সরকারি কোনও বড়সাহেব আসবেন বলে আমাদের বুকিং বাতিল হয়ে গেছে। খুব মুশকিল। আত্মানন্দজী নেমে পড়লেন যুদ্ধে। বনবিভাগের বিভিন্ন আমলার কাছে ফোন গেল। শেষে কর্তাব্যক্তিদের কাছে একটা ছোট বাংলো পাওয়া গেল যাতে মূল ঘর একটি। সেখানে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা জল-দেওয়া এয়ারকুলার বসানো হল। বিছানায় মহারাজের নিজস্ব চাদর বালিশ পেতে মহারাজের থাকার ব্যবস্থা ঠিক করা হল। স্থির হল বাকি সাধুরা বাড়িটার ছাদে শোবেন। পূজ্যপাদ মহারাজ আমাকে বললেন, ''তুমি আমার কাছে, সুপ্রভাতের পাশে, আমার ঘরে শোবে।'' আমি ঠস্‌সু, আমি দেখেছি ঘরের কাছে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, উঠে দেখেও এসেছি। আমি মহারাজকে বললাম, আমি ওই টাওয়ারে শোব। মহারাজের খুব আপত্তি, কারণ বাঘ খাড়া মই বেয়ে উঠতে পারে। এমন সময় আত্মানন্দজী বললেন, ''আমিও ঠস্‌সুর সঙ্গে ওখানে শোব।'' মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ''তাহলে যেতে পার। বাঘ অত বোকা নয় যে, আত্মানন্দের অতখানি মাংস ফেলে তোমাকে ধরবে।'' হাসির ঝড় উঠল। পাতাঝরা শাল, সেগুন গাছের ফাঁক দিয়ে সারারাত গরম হাওয়া বইতে লাগল, ঘুমোব কী! একটা বালতি করে জল আর আমার গামছাটা নিয়ে গেলাম। আত্মানন্দজী পাশে শুয়ে, গরমে 'উঃ আঃ' করেন আর গায়ে পিঠে জল মাখাই। রাত কাটল, সকালে মহারাজকে আত্মানন্দজী বলছেন, ''মহারাজ, আপনার চেলা আমায় কাল সারারাত ভিজে বেড়াল করে রেখে দিয়েছিল।''

সংগঠক হিসাবে অতুলনীয়, দৃপ্ত পৌরুষ, হাসি-মজাতে আসরের মধ্যমণি, সেইসঙ্গে পাণ্ডিত্য। বাংলাদেশে কোথাও কখনও ছিলেন না, অথচ এত সুন্দর বাংলা বলতেন যে, তাঁর মাতৃভাষা যে বাংলা নয় তা বোঝাই যেত না। শুধু তাই নয়, টানা হাতের লেখায় বাংলা লিখতেন খুব সুন্দর। আমি মজা করে চিঠি দিতাম দেবনাগরী অক্ষরে বাংলা ভাষায়, আর তিনি উত্তর দিতেন সুন্দর বাংলা অক্ষরে হিন্দি ভাষায়। রাজস্থানে খেতড়িতে সবাই আছি, এক স্থানীয় অধ্যাপক তাঁকে বলছেন, ''মহারাজ, আপ তো বহোৎ বঢ়িয়া হিন্দি বোল লেতে হেঁ।'' সবাই ওঁকে অপ্রতিভ করে হো হো করে হেসে উঠল। তিনি আমাদের সঙ্গে ওঁকে ঝরঝরে বাংলায় কথা বলতে শুনেছেন, তাই বাঙালি বলেই ধরে নিয়েছেন। এ-ভুল অনেকেরই হত। এসবের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের উল্লেখ না করলে ভুল হবে। পতঞ্জলির 'জাত্যান্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ' ও 'নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ' (যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ ২-৩) সূত্র দুটির আলোয় ডারউইনের বিবর্তনবাদের আলোচনা অমরাবতীর কলেজ অডিটোরিয়ামে তাঁর মুখে শুনেছি, পরপর দুদিন দুঘণ্টা করে বক্তৃতায়। রামচরিতমানস পাঠ ও তার মনোজ্ঞ আলোচনা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত। প্রশাসনের ওপরমহলে ও শিল্পপতি মহলে, বিশেষত বিড়লা পরিবারে তাঁর অতি উচ্চ সম্মান ছিল। তাঁর সাধুতার এক বিরল পরিচয় পেয়েছি বিলাসপুরে। বিলাসপুর আশ্রমে বিকেলবেলায় এক বাঙালি মহিলা এসেছেন তাঁর যুবক ছেলেকে নিয়ে, পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীকে প্রণাম করতে। ছেলেটির চোখ দুটি দেখে ভাল লাগল না—যাকে বৃষচক্ষু বলে—ছোট ছোট ও লালচে, মুখেও রুক্ষতা। মহিলাটির কোনও ব্যাপারে অনুচিত কৌতূহল ও প্রশ্ন শুনে আত্মানন্দজী

বলেছেন, ''তোমার ও নিয়ে মাথাব্যথা কেন মা, মহারাজকে প্রণাম করে নাও এবং প্রসাদ নিয়ে আবার কাল এসো।'' মাথাব্যথা কথাটি নাকি অপমানজনক, এই বলে সেই ছেলেটি মহারাজকে এমন যাচ্ছেতাই অপমান করতে লাগল যে তাকে জোর করে বাইরে নিয়ে যেতে হল। মহারাজ প্রথমে বিবর্ণমুখে একটু বসে রইলেন, তারপর শুনছি নিজের কাঁধে চাপড় মেরে বিড়বিড় করে বলছেন, ''তেরা বহুৎ ঘমণ্ড হুয়া থা, অব মিলা না দাওয়াই, চল্ চল্।'' সম্মানের চূড়ায় বসে থাকা কাউকে এত তাড়াতাড়ি অপমানকে অহংকারের ওষুধ বলে হজম করে নিতে দেখিনি। কয়েকবছর বাদে গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর শরীর চলে গেলে মনে একটা জোর ধাক্কা লেগেছিল। তাঁর শূন্যতা ভরাট হতে বেশ সময় লেগেছিল।

অনেক বছর আগে একবার উত্তরকাশীতে আছি পাঞ্জাব-সিন্ধ ছত্রের উলটোদিকে। স্বামী সূর্যানন্দজী উত্তরকাশীর রামকৃষ্ণ মিশনের কুঠিয়ার দায়িত্বে ছিলেন। রোজ সকাল দশটার সময় ছত্রে ভিক্ষা করতে আসতেন। একদিন তাঁকে ধরে বললাম, ''মহারাজ একদিন আমার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।'' বললেন, ''বেশ। কাল এই দরজায় না দাঁড়িয়ে ওই দরজায় গিয়ে 'নারায়ণ হরি' করব। তবে ভিক্ষা আমার ঝোলায় দিতে হবে, তুমি সামনে বসিয়ে খাওয়াবে তা হবে না। আমি যেমন নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে খেয়ে যাই তেমনই খাব।'' আকাঙ্ক্ষা পুরোটা না মিটলেও খানিকটা তো মিটবে, তাই রাজি হলাম। সবজি বলতে আলু, বাঁধাকপি আর ফুলকপিই পাওয়া যায় তখন। মুগের ডাল আর বাঁধাকপি রাঁধলাম, রুটি বানাবার ব্যবস্থা নেই তাই ছত্র থেকে রুটি কিনে আনলাম। মহারাজ যথাসময়ে এসে রান্না দেখে বললেন, ''দুরকম তো নেব না, যে-কোনও একটা দাও।'' কী করি, ছত্রের ডাল রোজই খান তাই বাঁধাকপি দিলাম।

পরদিন সকালে কুঠিয়াতে গিয়ে দেখি উঠোনের মাঝখানে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালা, তার ওপরে তিনটে পাথরের ওপর একটা বড় গামলা বসানো, জল গরম হচ্ছে। সেই গরম জল তিন-চারটে ফ্লাস্কে ঢেলে রাখছেন, যাঁরা তপস্যায় এসেছেন তাঁদের ব্যবহারের জন্য। দেখলাম গিরিশানন্দজী ওখানে তপস্যায় এসেছেন। সূর্যানন্দজীকে বললাম, ''কাল একটু রান্না করে এখানে নিয়ে আসব, তাহলে সকলে খেতে পারবেন।'' হয়তো সকলের কথা ভেবে রাজি হলেন। সকালে ওই বাঁধাকপি ও ডাল অনেকটা রেঁধে কুঠিয়ায় দিয়ে এলাম। বিকেলে বাসন নিতে গেলে গিরিশানন্দজী বলছেন, ''বাঃ এ তো প্রোফেশনাল কুক দেখছি।'' খাইয়ে, কিছু না হোক একটা সার্টিফিকেট তো পাওয়া গেল। সকালে গেলেই দেখতাম সূর্যানন্দজী জল গরম করছেন। বৃদ্ধ মানুষ, টলে টলে হাঁটেন। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে এভাবে হাঁটতে দেখে কেমন ভয় হচ্ছিল, যদি পড়ে যান তো গায়ে আগুন লেগে যাবে। একটি ভক্ত সাধু হবেন, তাঁর কাছে উপদেশ চাইছেন। মহারাজ বলছেন, ''আমি মঠে জয়েন করতে গিয়ে সম্পাদক মহারাজের কাছে যা শুনেছিলাম তাই বলতে পারি। বলেছিলেন—তুমি চাকরি করতে, বড় ডিগ্রি আছে, এখানে তার মূল্য কেউ দেবে না। হয়তো তোমাকে বাসন মাজতে হবে, ঘর পরিষ্কার করতে হবে, তোমার চেয়ে যে সিনিয়র সে তোমার চেয়ে কম জানলেও তার কথা শুনতে হবে, প্রণাম করতে হবে। অহংকারের পুঁটলিটি ফেলে আসতে পারলে এসো।'' উত্তরকাশী সাধুসমাজের চালচলনে অভ্যস্ত মহারাজকে খুব ভাল লেগেছিল। ওই বয়সেও ছত্রে ভিক্ষা, যদৃচ্ছালাভে জীবন কাটাচ্ছেন, সে-কৃচ্ছ্রতার গভীরতা এখন তাঁর বয়স পেরিয়ে এসে নিজের দিকে তাকিয়ে ভালই বুঝতে পারি। যদিও আমার আশঙ্কা অনুযায়ী নয়, তবে কয়েক বছর পরে হঠাৎ অন্যভাবে গায়ে আগুন লেগেই মারা যান তিনি। ঠাকুরের ইচ্ছা কে বুঝতে পারে! *ক্রমশ*